ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 664-672
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.256

‘বাঙ্গলার কথা’ ও ‘বাঙালি পেট্রিয়টিজম্’: ব্যক্তিত্ব ও ব্যবধান: একটি তুলনামূলক আলোচনা

রাহুল মণ্ডল, *গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 10.01.2026; Accepted: 13.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article presents a comparative study of Chittaranjan Das’s *Banglar Katha* and Pramatha Chaudhuri’s *Bangali Patriotism* in the context of early twentieth-century Bengal, a period marked by the Swadeshi movement, the rise of nationalist politics, and critical reassessment of Western education. Focusing on Bengal as the central conceptual space, the article examines how these two influential figures articulated ideas of Bengali identity, provincial nationalism, and their relationship with broader Indian nationalism.

Chittaranjan Das, as a lawyer and nationalist leader, projected an inclusive and integrative vision of Bengal, emphasizing cultural unity across religious and social divisions and linking Bengal’s past glory with the political responsibilities of the present. His understanding of nationalism sought to harmonize regional consciousness with an all-India struggle against colonial rule. In contrast, Pramatha Chaudhuri, a leading literary intellectual, conceptualized Bengali identity as culturally distinct and psychologically autonomous, often highlighting the uniqueness of Bengali society and literature within India. His critique of Western education and his skepticism toward the Indian National Congress further differentiated his position.

Despite these differences, the article argues that both thinkers shared significant common ground. Both were Western-educated yet increasingly critical of colonial educational models, both demonstrated deep emotional attachment to Bengal, and both ultimately rejected any rigid separation between love for Bengal and love for India. Their writings reveal that provincial or sub-national consciousness did not negate Indian nationalism; rather, it functioned as one of its vital sources.

By analyzing the convergences and divergences in their political thought, cultural outlook, and literary engagement, this study underscores the complexity of regional nationalism in colonial India and highlights Bengal’s dual role as a site of distinct cultural identity and as an integral component of the wider Indian nationalist movement.

Keywords: Bengal, Nationalism, Literature, Patriotism, India

বিংশ শতকীয় ভারতীয় রাজনীতিতে শুরু থেকেই এক পরিবর্তন, পরিমার্জনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। মূলত বঙ্গভঙ্গের সময়কালে স্বদেশী ও বয়কটের মধ্য দিয়ে বাংলাকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক পালা বদলের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তা বাংলায় স্বাদেশিকতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিল। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় সংগঠিত স্বদেশি আন্দোলনের সময় থেকে বিশের দশকের ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিবর্তন হয়েছিল কারণ ভারতের অপরাপর অঞ্চলগুলিতেও জাতীয়তাবাদী চেতনার বিস্তার ঘটেছিল, এবং সেইসঙ্গে

আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সত্তা নির্মাণের একটি সমান্তরাল ধারার প্রসারও ঘটেছিল।[১] পাশাপাশি এই সময় বাংলাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় রাজনীতিতে একদিকে যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটেছিল, তেমনই অন্যদিকে সাংস্কৃতিক জগতে স্বদেশী সাহিত্য, গান প্রভৃতি লেখালেখির এক জোয়ার এসেছিল। এই সময় বাংলার বিপ্লবী কার্যকলাপের পাশাপাশি ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর আগমন এক আদর্শগত সংঘাতের প্রেক্ষাপটের সূচনা করেছিল। এই সময়কালের অনেকে গান্ধীবাদী অহিংস মতাদর্শের প্রতি সম্মতি জানিয়ে নিজস্ব রাজনৈতিক পন্থা বেছে নিয়েছিলেন, অপরদিকে গান্ধীবাদ-বিরোধী হিংসাত্মক বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে অনেকে পথ খুঁজে পেয়েছিলেন।

বাংলাকে কেন্দ্র করে এক নতুন 'বঙ্গীয় দেশাত্মবোধ' বিস্তার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সূচনা ঘটেছিল এক নতুন প্রবণতা, যাকে রাজনীতির বাঙালিয়ানা বলা চলতে পারে। আর এই প্রক্রিয়ায় ভূমিকা নিয়েছিল এক নতুন প্রজন্ম, যাদের অনেকেই ছিলেন মফস্বলের। তাছাড়া এসময়ে সৃষ্টি হয় এক নতুন সাংস্কৃতিকপরিমণ্ডল; সাহিত্যের এই সময়কালকে কল্লোল যুগ (১৯২৩-২৯) বলা হয় যা নতুন ভাবনা নিয়ে এসেছিল। আর গ্রাম, ছোটো শহর এবং কলকাতার বিস্তীর্ণ পশ্চাদ্ভূমির জীবনযাত্রার সঙ্গে ব্যাপৃত ছিল; যে দিকটা কলিকাতার পূর্ববর্তী এলিট গোষ্ঠীর দ্বারা অবজ্ঞাত থেকে গিয়েছিল।[২] এই প্রেক্ষাপটে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জনের (১৮৭০-১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ) রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের সূত্রপাত ঘটে। ওইবছর এপ্রিল মাসে ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে দেওয়া ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি রাজনীতির জগতে পদার্পণ করেন।[৩] পাশাপাশি এই রাজনৈতিক পরিসরেই নিজের সাহিত্যিক প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিখ্যাত প্রাবন্ধিক-সাহিত্যিক প্রমথনাথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ)।

চিত্তরঞ্জন দাশ আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে নিজের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা করলেও আইনজীবী হওয়ার সুবাদে এর পূর্বে তাঁর বিভিন্ন বিপ্লবী রাজনীতিবিদদের সঙ্গে যোগ ছিল। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন তিনি, এই সভাতেই তিনি তাঁর বিখ্যাত *'বাঙ্গলার কথা'* নামক বক্তৃতাটি প্রদান করেন। অন্যদিকে বাংলার এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই সাহিত্যিক প্রমথনাথ চৌধুরী তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকায় এক জনৈক বন্ধুর উদ্দেশ্যে লেখা চিঠির প্রত্যুত্তর হিসেবে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন *'বাঙালি পেট্রিয়টিজম্'* নামক প্রবন্ধটি।

উভয়ের আলোচনার মূল কেন্দ্র বাংলাকে ঘিরে। একই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে বাংলাকে স্থান দিয়েছেন। কারণ, তাঁরা উভয়েই প্রথমে বাঙালি, পরে ভারতীয়। যদিও, এই দুই পরিচিতির মধ্যে তাঁরা উভয়েই কি কোনো পার্থক্য করেছিলেন? তাঁদের কাছে কোন পরিচিতিটা বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল? তাঁদের কাছে তাঁদের জন্মভূমি বাংলার প্রতি যে প্রেম ও ভালোবাসা অর্থাৎ এই প্রাদেশিক দেশপ্রেমের (Provincial Nationalism/Sub-Nationalism) সঙ্গে কি তাঁদের বৃহত্তর দেশপ্রেম অর্থাৎ ভারত-প্রেমের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল? নাকি চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতা (বাঙ্গলার কথা) ও প্রমথ চৌধুরীর লেখনীতে (বাঙালি পেট্রিয়টিজম্) বাংলা ও ভারত-প্রীতি মিলেমিশে গিয়েছিল? এছাড়া উভয়েই বাংলার প্রতি যে প্রেম ও অনুরাগ দেখিয়েছেন, তার মধ্যে কি কোনো দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছিল? – এসবগুলি এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। একজন আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ অন্যদিকে অপরজন সাহিত্যিক। সুতরাং, উভয়ের চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে পার্থক্য থাকবেই তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু, যদি আমরা উভয়ের ব্যক্তি জীবন লক্ষ করি তবে বেশ কিছু বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাবো। যেমন– বাঙালি হলেও দুজনেই ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত। (চিত্তরঞ্জনের) পড়াশুনা প্রথমে সেযুগে বাংলার সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রেসিডেন্সি কলেজে, পরে আইন শিক্ষা লন্ডনের ইনার টেম্পল এবং ইংলন্ডের বার

কাউন্সিলে।[৪] অন্যদিকে প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে একথা স্পষ্ট লিখেছেন যে, তিনি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালি থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনিও বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। কিন্তু মন দিয়ে প্র্যাকটিস্ করলেন না কোনদিন।[৫] উভয়েই ইংরেজি শিক্ষিত হলেও একটা সময়ের পর দুজনেই ইউরোপীয় শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং তা নিয়ে সমালোচনা করেন। যেমন– চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর *'বাঙ্গলার কথা'*- য় বলেছেন–

> "...আমার মনে হয়, ইংরাজী শিক্ষার সাহায্যে শিক্ষাবিস্তার করায় অনেক দোষ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। আমাদের হাব ভাব, আচার-ব্যবহার সবই এত ইংরাজী নবীশ হইয়াছে যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, শিক্ষিত বাঙ্গালীর সঙ্গে বাঙ্গলাদেশের কোনো যোগ নাই।... বিলাতের ফ্যাকটরিতে যেমন নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়, আমাদের ইউনিভারসিটি ফ্যাকটরিতে বি.এ., এম.এ., পি.এইচ.ডি., পি.আর.সি., এইরূপ কতগুলি জীব তৈয়ারী হয়, প্রকৃত মানুষ তৈয়ারী হয় না।"[৬]

অন্যদিকে প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'বাঙালি পেট্রিয়টিজম্'-এ নিজের প্রতি ব্যাঙ্গ করে লিখেছেন–

> "... বাংলাদেশের বাঙালির ঘরে জন্মালেও আমি খাঁটি বাঙালি নই।... পাঁচ থেকে প'চিশ বৎসর বয়েস পর্যন্ত ইংরেজি-শাসিত স্কুল-কলেজে ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে আমি হয়ে উঠেছি একজন নিয়ো-ইন্ডিয়ান ওরফে নন-ইন্ডিয়ান...।"[৭]

চিত্তরঞ্জনের আইনজীবী হিসেবে খ্যাতি ছিল প্রচুর, স্বদেশী আন্দোলনের সময় কয়েকটি চাঞ্চল্যকর মামলা লড়ে তাঁর জনজীবনে প্রবেশ। এই মামলাগুলিতে তিনি অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের রক্ষা করেছিলেন। বস্তুত এই মামলাগুলির খ্যাতিই তাঁকে পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে অন্যতম সফল আইনজীবীর পরিচয় দিয়েছিল। ১৯১৭ সালে তিনি সরাসরি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আঙিনায় পা রাখেন। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে ভারতের সফলতম আইনজীবী উকিলের শামলা পরিত্যাগ করে পুরোদস্তর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। হয়ে ওঠেন বাংলার মানুষের নয়নের মণি।[৮] অপরদিকে প্রমথ চৌধুরী আইনজীবী হিসেবে তেমন খ্যাতি লাভ না করলেও প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। *'সবুজ-পত্র'* প্রমথ চৌধুরীর অনবদ্য সৃষ্টি। পত্রিকাটির মাধ্যমে তিনি গড়ে তুলেছিলেন-বাঙলা সাহিত্যের 'বীরবলী যুগ' ও 'বীরবলী চক্র'।[৯] অন্যদিকে, চিত্তরঞ্জন দাশের পেশাগত সাফল্য ছাড়াও তাঁর চরিত্রের আরেকটা দিক ছিল সাহিত্যচর্চা। তিনি শুধু যে পাঁচটি উঁচুদরের কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা, বেশ কয়েকটি গল্প আর প্রচুর উপাদেয়, সুচিন্তিত প্রবন্ধের লেখক তাই নয়, এর পাশাপাশি তিনি নিজের পেট থেকে বহু অর্থ ব্যয় করে সেযুগের অন্যতম সেরা সাহিত্যপত্র 'নারায়ণ' সম্পাদনা করেছেন বেশ কিছুদিন ধরে।[১০]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাকে কেন্দ্র করে এদেশে যে পাশ্চাত্য ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল সেখানে এদেশীয়রা পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আপন করে নিয়েছিল। কিন্তু, এই শতকেরই দ্বিতীয়ার্ধে বা শেষদিকে এর এক উল্টো চিত্র লক্ষ করা যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে এদেশীয়দের মোহ ভঙ্গ হয়। অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরি তাঁর *"Europe Reconsidered: Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal,"* (১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ) গ্রন্থে এরকমই একটি পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করেছেন। তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৮-১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ খ্রিষ্টাব্দ) প্রমুখ পাশ্চাত্য শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে এই প্রবণতা কীভাবে ফুটে উঠেছে তা দেখিয়েছেন। এই একই প্রবণতা আমরা চিত্তরঞ্জন দাশ এবং প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য ও লেখার মধ্যে লক্ষ করলেও তাঁদের উভয়ের ক্ষেত্রে একটি জায়গায় সূক্ষ্ম পার্থক্য ছিল। প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিষয়ে অনীহা বা ব্যাঙ্গ করলেও তিনি

একথা স্বীকার করেছেন যে, ইউরোপীয় শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের দেশে যে উচ্চশিক্ষা প্রদানের যে ব্যবস্থা ব্রিটিশদের দ্বারা করা হয়েছে তা ভারতবাসীর জাতীয় শক্তিকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন-

> "আজ ইউরোপীয় শিক্ষা বয়কট করবার যে হুজুক উঠেছে তাতে যে বাঙালি সোৎসাহে যোগদান করতে পারছে না, তার কারণ... উচ্চশিক্ষাই হচ্ছে আমাদের জাতীয় শক্তি উদবোধিত করবার সর্বপ্রধান উপায়।"[১১]

অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর বক্তৃতার 'আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা' অংশে তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার এক পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করেছেন। তিনি বাংলার অতীতে যে রামায়ণ-মহাভারত, চন্ডীগান, ভাগবত পাঠ, হরিভজন প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তারের প্রক্রিয়া চালু ছিল তার এবং বাংলার বিভিন্ন জেলায় যে টোলভিত্তিক শিক্ষা প্রণালী ছিল তার মাধ্যমে শিক্ষাদানে পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেছেন–

> "রামমোহন যে ইংরেজি ভাষার শিক্ষা ও যে ইংরাজী ভাষার সাহায্যে দেশের শিক্ষা বিস্তার করিবার পন্থা দেখাইয়া দিয়েছিলেন– তাহা হয়ত ঠিক সেই সময়ে আবশ্যকীয় ছিল।... আমাদের উচ্চশিক্ষা আমাদের ভাষায় দিতে হইবে।"[১২]

প্রমথ চৌধুরী এবং চিত্তরঞ্জন দাশের ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রে একটি বড়ো সাদৃশ্যের জায়গা হল দুজনেরই কোনো না কোনোভাবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এবং উভয়েই রবীন্দ্র-ঘনিষ্ঠ ছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সরাসরি পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করেন। অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন একটা সময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির খামখেয়ালি ক্লাবের সভ্য ছিলেন। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রমুখের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ঘটে। চিত্তরঞ্জন যখন দ্বিতীয়বার বিলেত যান তখন চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন। সেদিন রবীন্দ্রনাথ 'সোনারতরী' কাব্য থেকে কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে চিত্তরঞ্জন দাশও তাঁর 'সাগর সংগীত-এর' পান্ডুলিপি থেকে কয়েকটি কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন।[১৩]

তবে প্রমথ চৌধুরী ও চিত্তরঞ্জনের মধ্যে রবীন্দ্র সংযোগের এই সাদৃশ্য থাকলেও এক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে একটি পার্থক্য ছিল। বলা হয়ে থাকে– চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত পত্রিকা 'নারায়ণ' এর লেখক সূচীতে রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতি চিত্তরঞ্জনের রবীন্দ্র বিরোধীতার বহন করে। তৎকালীন প্রায় সব বিশিষ্ট লেখক যেমন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন প্রমুখ লেখালেখি করতেন। রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট পরিচিত নাম হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের লেখাই 'নারায়ণ'-এ প্রকাশিত হয়নি।প্রমথ চৌধুরীর জীবনীকার জীবেন্দ্র সিংহ রায় এপ্রসঙ্গে লিখেছেন– 'নারায়ণ' (১৩২১) পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তি-চিত্তরঞ্জন দাস সম্পাদকরূপে ও বিপিনচন্দ্র পাল ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ও লেখকরূপে। বস্তুতঃ, রবীন্দ্র-বিরোধী ও 'সবুজ-পত্র'-(সবুজ-পত্রের লেখকসম্প্রদায় ও প্রমথ চৌধুরী সহ) বিরোধী পত্র হিসেবেই নারায়ণের আত্মপ্রকাশ।[১৪] চিত্তরঞ্জন তাঁর বিরুদ্ধে রবীন্দ্র বিদ্বেষের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছিলেন–

> "কথাটা ঠিক হলনা, আমি রবিবিদ্বেষী একেবারেই নই, অলৌকিক প্রতিভা আমি কখনও অস্বীকার করিনা, তবে তাঁর সব লেখাই যে ভালো লাগে তা বলতে পারি না।"[১৫]

তার মানে রবীন্দ্র-প্রতিভা নিয়ে চিত্তরঞ্জন দাসের কোনো প্রশ্ন ছিল না। দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছিল, তাই চিত্তরঞ্জন হয়ত নিজের অজান্তে রবীন্দ্রবিরোধী অবস্থান নিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাতেও নারায়ণ পত্রিকায় রবীন্দ্রবিরোধী লেখা ছাপা হওয়ার পরও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের সৌহার্দ্য কিংবা সৌজন্যটায় কোনও ঘাটতি ছিল না।

অন্তত দেশব্রতী চিত্তরঞ্জনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে লেখা "এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ।/মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"[১৬]

অন্যদিকে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকার আত্মপ্রকাশের (১৩২১ বঙ্গাব্দ) মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গল্প সাহিত্যে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের মোট দশটি গল্প প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে অন্যতম ছিল– 'হালদার গোষ্ঠী', 'হৈমন্তী', 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীর পত্র' প্রভৃতি।

তবে চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতায় খানিকটা ব্যাঙ্গচ্ছলে বা অস্পষ্টভাবে রবীন্দ্র বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন তিনি তাঁর বক্তব্যের প্রথমদিকে স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' কীভাবে বাঙালি জাতিকে তার স্বরূপ চিনতে সাহায্য করেছিল তা উল্লেখ করেছেন। তবে, অন্য আরেক প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন –

> "... যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জলকে সত্য করিবার কামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ এখন স্যার রবীন্দ্রনাথ – এবার আমেরিকায় এই মতটি নাকি খুব জোরের সঙ্গে জাহির করিয়াছেন। ... সেই মতের, এই ক্ষেত্রে বাঙালী জাতির এই মহাসভায় সভাপতির আসন হইতে প্রতিবাদ হওয়া উচিত মনে করি।"[১৭]

তবে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে এমন কোনো রবীন্দ্র-বিরূপতার লক্ষণ দেখা যায় না।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের আরেকটি ক্ষেত্র হল চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথমদিকে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত না হলেও ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে সভাপতিত্বের মাধ্যমে তিনি কংগ্রেসের সদস্য হন। কিন্তু, প্রমথ চৌধুরী তাঁর জীবনে কোনো পর্যায়ে এসেই কংগ্রেসের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হননি। তাঁর 'বাঙালি-পেট্রিয়টিজম্' প্রবন্ধে তিনি কংগ্রেস ও তার সদস্যদের বিষয়ে নানা ব্যাঙ্গ করেছেন। তিনি কখনও পরোক্ষভাবে কংগ্রেসের নেতাদের 'নন্-ইন্ডিয়ান' বলেছেন। এছাড়া কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনকে 'দিন তিনেক ধরে কচায়ন করে' প্রভৃতি বলে ব্যাঙ্গ করেছেন। এছাড়াও কংগ্রেসী পেট্রিয়াটিজমের মূলে আছে নাকি 'বিলেতি পুঁথি পড়া মন' এবং কংগ্রেসের কিছু নেতাদের তিনি 'টিকিওয়ালা-ডিমোক্রাট-রূপ-উদ্ভূত জীব' প্রভৃতি বলে উপহাস করেছেন।[১৮] তবে প্রমথ চৌধুরী তাঁর *'আত্ম-কথা'- য় লিখেছেন-* আমি যেদিন সন্ধ্যায় লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছোই, তার পরের দিনই Inner Temple-এ ভর্তি হই, আর সেই দিন সন্ধ্যাবেলায়ই সেখানে dinner খেতে যাই...। আমি গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড খানা-কামরা লোকে ভরতি। একটি টেবিলে এক বাঙ্গালী ছোকরা বসেছিলেন, তাঁর পাশের চেয়ার খালি দেখে আমি সেই চেয়ারে বসে পড়লুম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন-

-আপনি বাঙ্গালী?

-হাঁ।

-বিলেতে এলেন কবে?

-গতকল্য।

-আমি আপনাকে ছুরিকাঁটা ব্যবহার করতে শেখাই।

-আচ্ছা।

এর পর তিনি আমাকে শেখাতে লাগলেন যে ডান হাতে ধরতে হয় ছুরি, আর বাঁ হাতে কাঁটা। আর কোন্ কাঁটা-ছুরিতে মাছ খেতে হয়, তাও দেখালেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলুম। তারপরে প্রথমে যখন সুরুয়া এল, ভিতরে খোঁদলকরা, প্লেটে, তখন তিনি সে প্লেটটি বুকের দিকে হেলিয়ে চামচ দিয়ে স্তূপ তুলে খেতে লাগলেন। আমি

তাঁকে বল্লুম- "এ প্লেটটি উল্টো দিকে হেলাতে হয়।" তিনি বল্লেন- "আপনি আমাকে শেখাতে এসেছেন?" তখন আমি বল্লুম- "তাকিয়ে দেখুন, ইংরেজরা কিরকম করে স্তূপ খাচ্ছে।" এক নজর দেখে, হাতের চামচ রেখে দিয়ে তিনি আমাকে নমস্কার করলেন। এই ছোকরাটির নাম নলিনী বাঁড়ুজ্যে, আরার বড় উকিল কৈলাসবাবুর ছেলে। বাঙ্গালী, কিন্তু বেহারী বাঙ্গালী।নলিনী ছিলেন সুদর্শন আর অসাধারণ বলিষ্ঠ। পরে তিনি আমার একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু হন।

এ ঘটনা উল্লেখ করবার কারণ এইটে দেখানো যে, আমি বিলেত যাবার পূর্ব্বেই ইংরিজী খানাপিনায় অভ্যস্ত ছিলুম। আমি যে তখন পলিটিক্সে ঘোর স্বদেশী ছিলুম তার প্রমাণ উক্ত টেবিলে আমার অন্য পার্শ্বে একটি ধনী পার্শী যুবক বসেছিলেন; তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন- "তুমি কি একজন কংগ্রেসওয়ালা?" উত্তর-"হাঁ।" এ কথা শুনেই তিনি কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন।[১৯]

অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর বক্তৃতায় স্পষ্ট বাংলা তথা ভারতের যে মুক্তি আন্দোলন তার নেতৃত্বে ভ্রান্তি আছে, সেখানে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণের অভাব রয়েছে প্রভৃতির কথা বললেও জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে তেমন কোনও ব্যাঙ্গ বিদ্রূপ তিনি করেননি।

বেশ কিছু বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও তাঁদের দুজনের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণই বেশি ছিল। উভয়েরই বক্তব্যের মূল ক্ষেত্র বাংলা এবং বাংলার প্রতি ভালোবাসা ও বাঙালি দেশপ্রেম হলেও তাঁদের দুজনের বলা এবং লেখার মধ্যে দৃষ্টিগত অর্থাৎ বাংলাকে কল্পনালোকে দেখার মধ্যে পার্থক্য ছিল। প্রমথ চৌধুরী তাঁর লেখায় বাঙালি জাতিকে সর্বদা একটি আলাদা জাতি হিসেবে ও বাংলাকে একটি আলাদা প্রদেশ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন–

> "বর্তমান ভারতবর্ষে বাংলা সাহিত্যের তুল্য দ্বিতীয় সাহিত্য নেই। ভারতবর্ষের অপর কোনো জাতি দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের জন্মদান করতে পারেনি। ... মনোজগতে আমরা ব্যক্তি ভারতবর্ষের সঙ্গে একলোপে বাস করি নে। ...ইউরোপের সাহিত্য বিজ্ঞানের শিক্ষা আমরা যতটা আত্মসাৎ করেছি, ভারতবর্ষের অপর কোনো জাত তদনুরূপে পারে নি। ...আমাদের পুঁথিপড়া মনের সঙ্গেও বাকি ভারতবর্ষের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। সুতরাং, আমাদের পলিটিক্যাল মনও অন্য প্রদেশের পলিটিক্যাল মনের ঠিক অনুরূপ নয়।"[২০]

অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন দাশ বাঙালি জাতির এক সমন্বয়ী সর্বজনীন চিত্র তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন–

> "বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃস্টান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। ... বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী সেই সৃষ্টি স্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি।"[২১]

এছাড়া তিনি বাংলাকে মাতৃরূপে কল্পনা করে বলেছেন–

> "মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। ... যেরূপ বিশিষ্ট, সে অনন্ত!"[২২]

প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন–

> "বাঙালি বাঙালি মাত্রেরই স্বজন, তার কারণ ভাষার যোগ হচ্ছে মানসকায়ে রক্তের যোগ। সুতরাং, বাঙালিদের পরস্পরের প্রতি নাড়ির টান থাকাই স্বাভাবিক। না থাকাটাই অদ্ভূত।"[২৩]

- এর অর্থ কি তবে বাঙালি জাতি ব্যতীত অন্যান্য সমগ্র বৃহত্তর ভারতবাসী, যাদের সঙ্গে রক্তের বা ভাষার কোনো যোগ নেই তাঁদের সঙ্গে বাঙালির কোনো আত্মিক যোগ গড়ে উঠবে না বা তা কি সম্ভব নয়? এ নিয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে। কিন্তু, চিত্তরঞ্জন তাঁর বক্তব্যে এমন কোনো মন্তব্য করেন নি। তিনি এক সমন্বয়ী বাঙালি

জাতিকে কল্পনা করেছেন। তাদের জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, নিজেদের অধিকারে সরব হতে, প্রতিবাদে সামিল হতে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উভয়ের বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে আমরা যে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা চালিয়েছিলাম তার উত্তর বোধহয় এবার দেওয়া যেতে পারে। ব্যক্তিত্ব হিসেবে উভয়ের মধ্যে কিছু মিল-অমিল যেমন ছিল তেমনই তাঁদের বক্তব্যের এবং লেখার মধ্যেও কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে, সেগুলি মোটামুটি আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করলাম। তবে, একটি বিষয়ে উভয়েরই মধ্যে সাদৃশ্য এখানেই যে, তাঁরা দুজনেই তাঁদের নিজ জন্মভূমি বাংলাকে ভালোবাসা বা বাঙালি দেশপ্রেমের সঙ্গে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে ভালোবাসার মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। কারণ, তৎকালীন বাংলা ও ভারতের সমস্যা ও শত্রু একই ছিল– ইংরেজ সরকার। তাই, তাঁদের এই বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে যে প্রাদেশিক দেশপ্রেমের জয়গান সূচিত হয়েছে তার সপ্তসুর মিলিত হয়েছে বৃহত্তর ভারতবর্ষীয় দেশপ্রেমের সঙ্গে।

তবে, এক্ষেত্রে কোনও পার্থক্য না থাকলেও প্রমথ চৌধুরী এবং চিত্তরঞ্জন দাশের বাংলাকে দেখার যে প্রেক্ষিত তার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছিল। চিত্তরঞ্জন তাঁর বক্তব্যে মূলত বাংলার গৌরবময় অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করেছেন এবং বর্তমান পরিস্থিতি থেকে বাংলার দুর্দশা রক্ষা করার জন্য সমবেত প্রচেষ্টার কথাও তিনি বলেছেন। অর্থাৎ, ইংরেজ শাসনের আগে বাংলায় যে সমৃদ্ধময় অবস্থা ছিল তা ইংরেজদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যেতে থাকে এবং সেই পূর্বের অবস্থাকে ফিরিয়ে আনার জন্যও তিনি নানা উপায়ের কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে যেমন লেখক লিখেছিলেন– 'মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন, মা যা হইবেন'– চিত্তরঞ্জনের বক্তব্যে ঠিক এই একই সুর ধ্বনিত হয়েছিল। তাই বলা যায়, চিত্তরঞ্জনের বাংলা প্রেম খানিকটা অতীতচারী গৌরবের খোঁজ এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নের বাংলা গড়ার অভিযান। এই অভিযানকার্যে তিনি জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন–

> "একবার এস ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, চন্ডাল, সব একত্র হইয়া সমস্বরে বলি – চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের তাহা চাই। ... ঐ যে মা ডাকতেছে। এস এস, সবাই এস! সম্মুখে বিস্তৃত কার্য্য, এস এস, সবাই এস! বল ঈশ্বর! বল! আল্লা! বল নারায়ণ, বল বন্দেমাতরম্।"[২৪]

এই প্রসঙ্গে তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তার শেষ রাজনৈতিক বক্তৃতায়, ১৯২৫ সালের ২ মে, বাংলা প্রাদেশিক সভায় বলেন যে স্থানীয় বা প্রাদেশিক জাতীয়তাবাদ এবং সমগ্র ভারতব্যাপী জাতীয়তাবোধের মধ্যে আসলে কোনো বিরোধ নেই। সমস্ত জাতীয়তাবোধ প্রকৃতপক্ষে আত্ম-পরিচিতি ও আত্মবিকাশের অনুসন্ধান এবং সেই পন্থায় শেষ উদ্দিষ্ট হবে একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র (Federation of the States of India) যেখানে প্রতি রাজ্যের মানুষ নিজ নিজ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের অনুসরণ করবে স্বাধীনভাবে, এবং ঐ স্বাধীন রাজ্যসমূহের সাধারণ স্বার্থ সাধন করবে সকলে মিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে।[২৫]

অন্যদিকে প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে অনেক জায়গায় বাংলার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পার্থক্য নির্দেশ করলেও, বাংলার প্রতি তাঁর যে প্রেম ও ভালোবাসা তার সঙ্গে ভারতবর্ষকে ভালোবাসার মধ্যে কোনো চীনের প্রাচীর নেই, যেকথা তিনি নিজেই তাঁর প্রবন্ধের একদম শেষে উল্লেখ করেছেন। চিত্তরঞ্জনের বাংলা দেশপ্রেম যেমন ছিল অতীতচারী বাংলা গৌরবপ্রীতি, অন্যদিকে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন– তিনি যে বাংলাকে ভালোবাসেন তা হল ভবিষ্যতের বাংলা–

> "... যে দেশকে আমি অন্তরের সহিত ভালোবাসি, সে বর্তমান বাংলা নয়, অতীত বাংলাও নয়– ভবিষ্যৎ বাংলা... আমার বাঙালি– পেট্রিয়টিজম্ বর্তমান ভারত-বর্ষীয়-পেট্রিয়টিজমের বিরোধী নয়।"[২৬]

পরিশেষে, বিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত প্রধান প্রবণতা বাংলার ইতিহাসকে নির্মাণ করেছিল তার মধ্যে সর্বাগ্রে আসে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে পুনর্ভাবনা এবং একটি নতুন ধরনের বাঙালি দেশাত্মবোধের বিকাশ। বাঙালিয়ানায় পরিপূর্ণ স্বাজাত্যপ্রেমের এক- নতুন চরিত্র সৃষ্টি করেন রাজনৈতিক নেতৃবর্গ একটি আঞ্চলিক সত্তা নির্মাণের প্রয়াসে, এবং বিদ্বজ্জনেরা তার ভিত্তিকে শক্ত করেন বাংলার ইতিহাস, ভাষা, এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান দ্বারা। তাদের এই নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য কখনোই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূলস্রোতের পরিপন্থী ছিল না এবং নির্মীয়মাণ ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যহীনতার প্রশ্নও এই নির্মাণকল্পে ছিল না। তথাপি ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে বাংলার ক্রমবর্ধমান প্রান্তিকতার আশঙ্কা বাংলার চিন্তকদের এই আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সত্তা নির্মাণপ্রকল্পকে প্ররোচিত করেছিল। ১৯২০-র দশকে একই সঙ্গে আরও একটি ধারা চোখে পড়ে, এটি হল রাজনীতির বাঙালিয়ানা (vernacularization of politics)। এর মানে কেবল এটাই নয় যে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা ও লেখায় নতুন ভোটাধিকার প্রাপ্ত এবং ইংরেজি শিক্ষাবিহীন মানুষদের কাছে পৌঁছোনোর চেষ্টা। সঙ্গে ছিল জনপরিসরের (public sphere) সামগ্রিক কার্যকলাপ বিশেষত ভাবপ্রকাশের ভাষ্য, বাগধারা ও শৈলীর মধ্যে দিশি বা বাঙালি ভাবের প্রবর্তন।[২৭]

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, সব্যসাচী। বাংলায় সন্ধিক্ষণ: ইতিহাসের ধারা ১৯২০-১৯৪৭। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৪, নয়া দিল্লী, পৃ. ৪।

২. তদেব, পৃ. ১৭।

৩. মুখোপাধ্যায়, শৌভিক। চিত্তচরিত: চিত্তরঞ্জন থেকে 'দেশবন্ধু' হয়ে ওঠার গল্প। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০২৫, নয়া দিল্লী, পৃ. ১৭৪।

৪. তদেব, পৃ. ৫।

৫. রায়, জীবেন্দ্র সিংহ। প্রমথ চৌধুরী। মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৮।

৬. দত্ত, মনীন্দ্র ও দত্ত, হারাধন (সম্পা.)। দেশবন্ধু রচনাসমগ্র (তৃতীয় খণ্ড: রাজনৈতিক প্রবন্ধ বক্তৃতাবলী) তুলি কলম, কলকাতা, পৃ. ৪৮।

৭. চৌধুরী, প্রমথ। প্রবন্ধ সংগ্রহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা। পৃ. ৪০৫।

৮. মুখোপাধ্যায়, শৌভিক। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪।

৯. রায়, জীবেন্দ্র সিংহ। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৪।

১০. মুখোপাধ্যায়, শৌভিক। প্রাগুক্ত। পৃ. ১০।

১১. চৌধুরী, প্রমথ। প্রবন্ধ সংগ্রহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা। পৃ. ৪১১।

১২. দত্ত, মনীন্দ্র ও দত্ত, হারাধন (সম্পা.)। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪৭।

১৩. মালিক, তপন। "কতখানি রবীন্দ্র বিদ্বেষী ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস"। https://bangla.asianetnews.com/life/know-about-the-relation-between-deshbandhu-chittaranjan-das-and-rabindranath-tagore-tmb-qjblan/articleshow-0niixr.

১৪. রায়, জীবেন্দ্র সিংহ। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৭।

১৫. মালিক, তপন। প্রাগুক্ত। https://bangla.asianetnews.com/life/know-about-the-relation-between-deshbandhu-chittaranjan-das-and-rabindranath-tagore-tmb-qjblan/articleshow-0niixr.

১৬. মালিক, তপন। প্রাগুক্ত। https://bangla.asianetnews.com/life/know-about-the-relation-between-deshbandhu-chittaranjan-das-and-rabindranath-tagore-tmb-qjblan/articleshow-0niixr.

১৭. দত্ত, মনীন্দ্র ও দত্ত, হারাধন (সম্পা.)। প্রাগুক্ত। পৃ. ২১।

১৮. চৌধুরী, প্রমথ। প্রবন্ধ সংগ্রহ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪১১।

১৯. চৌধুরী, প্রমথ। আত্মকথা। দি বুক এম্পরিয়ম লিমিটেড, কলকাতা। পৃ. ৮৮-৯০।

২০. চৌধুরী, প্রমথ। প্রবন্ধ সংগ্রহ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪০৯-৪১০।

২১. দত্ত, মনীন্দ্র ও দত্ত, হারাধন (সম্পা.)। প্রাগুক্ত। পৃ. ২০।

২২. তদে, পৃ. ২০।

২৩. চৌধুরী, প্রমথ। প্রবন্ধ সংগ্রহ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪০৪।

২৪. দত্ত, মনীন্দ্র ও দত্ত, হারাধন (সম্পা.)। প্রাগুক্ত। পৃ. ৬৮-৬৯।

২৫. ভট্টাচার্য, সব্যসাচী। প্রাগুক্ত। পৃ. ৮।

২৬. চৌধুরী, প্রমথ। প্রবন্ধ সংগ্রহ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪১২।

২৭. ভট্টাচার্য, সব্যসাচী। প্রাগুক্ত। পৃ. ১।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

শৌভিক মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।